শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন লীলা

- ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

১. ভূমিকা: আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ এর Gobardhan Arrives in Vrindaban নামক নিবন্ধ শ্রীমদ্ ভাগবত এর ১০ম স্কন্দ এবং গর্গসংহিতা - এর আলোকে শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন লীলা বর্ণনার চেষ্টা করবো।

২.গিরিগোবর্ধন কিভাবে এবং কেন ভৌমবৃন্দাবনে এলেন?

গিরিগোবর্ধন মূলত গোলোক বৃন্দাবনধামে অবস্থান করেন। দ্বাপর যুগের শেষদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভৌম বৃন্দাবন লীলা করবার জন্য সেখান থেকে গিরিগোবর্ধনকে এই জড় জগতের অবস্থিত হিমালয় পর্বতের নীচে অবস্থিত শাম্মলী দ্বীপ এবং দ্রোন পর্বতের সন্তান রূপে প্রেরণ করেন। এখন দেখা যাক কিভাবে তিনি ভৌম বৃন্দাবনে এলেন।

এদিকে পুলস্ত নামে একজন মুনি ছিলেন। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক। তাই তিনি শিবের মূল পীঠস্থান বারাণসীতে (কাশীতে) তপস্যা করতেন। (উল্লেখ্য যে এই পুলস্ত মুনির বংশেই দেবতা এবং রাক্ষস - এই উভয় শ্রেণীর জন্ম হয়। কিভাবে? একসময় দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অনেক অসুর নিহত হয়। কিছু অসুর আবার প্রাণ ভয়ে পাতালে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে দুইজন ছিল প্রধান: মালি এবং সুমালী। এক সময় মালি চিন্তা করলো ব্রাহ্মণের ঔরসে যদি তার কন্যা মালিনীর গর্ভে কোন ব্রাহ্মণ বা দেব সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তবে তার কূল উদ্ধার হতে পারে। এই ভেবে সে তার কন্যাকে পুলস্ত মুনির ছেলে বিশ্রবা মুনির নিকট সমর্পন করে। কালক্রমে এই মুনির ঔরসে মালিনীর একটি ছেলে হয়। তার নাম রাখা হয় কুবের এবং তাকে যৌবন বয়সে লঙ্কার অধিপতি করা হয়। মালির সেই ভাগ্য দেখে তখন সুমালীও তার কন্যা নিকষা-কে বিশ্রবা মুণির সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু নিকষা অত্যন্ত কামুক প্রকৃতির ছিল। একদিন ভরসন্ধ্যায় সে বিশ্রবা মুণির কাছে পুত্র লাভের জন্য অনুরোধ করে। মুণি তাকে বলেন যে এই সময় হল রাক্ষস সময় - অর্থাৎ ভালসন্তান জন্ম দেয়ার সময় নয়। কিন্তু নিকষা ছিল অতি কামার্ত। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। নিকষার গর্ভজাত পুত্র হলো রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ। প্রথম ২ জন দেব-দ্বিজ হিংসুক হলো। নিকষার কাতর প্রার্থনায় বিশ্রবার বরে তৃতীয়জন হলেন দেব-দ্বিজ-পরায়ণ। পরিণত বয়সে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ মিলে কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে লঙ্কা থেকে বের করে সেই জায়গা দখল করে নেয়। কুবের এখন স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের আশ্রয় লাভ করে এবং একসময় তাদের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতে থাকেন।

একসময় পুলস্তমুণির দেশভ্রমণের ইচ্ছা হয়। যে ভাবনা সেই কাজ। তিনি ভ্রমণ করতে একসময় হিমালয়ের পাদদেশের দ্রোণাচল পর্বতে এসে পৌঁছোন। দ্রোণ মুণিকে দেখে প্রণাম করে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যান এবং বিভিন্নভাবে তার সেবা করতে থাকেন। তিনি এই ব্যাপারে তার পুত্র গোবর্ধনকে নিয়োজিত করেন । গোবর্ধনও বেশ মনোযোগ দিয়ে মুণির সেবা করতে থাকে। এভাবে ৭/৮ দিন চলে যায়। সেবায় খুশী হয়ে মুণি মনে মনে ভাবলেন গোবর্ধনকে যদি কাশীতে নিয়ে যেতে পারেন তবে তার খুবই সুবিধা হবে। এই ভেবে তিনি বিদায় বেলায় দ্রোণ পর্বতের কাছে বিদায় নেওয়ার আগে বললেন যে তিনি গোবর্ধনকে তার সাথে নিয়ে যেতে চান। দ্রোণ পর্বত মনে মনে অখুশী হলেও মুণির শাপের ভয়ে রাজী হলেন এবং বললেন যে তার পুত্র গোবর্ধন রাজী থাকলে তার কোন আপত্তি নেই। গোবর্ধনকে মুণি জিজ্ঞেস করলে সে বললো যে যাওয়ার ব্যাপারে তার একটা শর্ত আছে। কি সেই শর্ত? না, তাকে কোথায়ও রাখা চলবে না। রাখলে যে স্থানে রাখা হবে সেখান থেকে গোবর্ধন আর অন্য কোথায়ও যাবে না, সেখানেই থেকে যাবে।
মুণি তার কথায় রাজী হয়ে গেলেন। তিনি গোবর্ধনকে তার বাম হাতের তালুতে রেখে কাশীর দিকে যাত্রা করলেন। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর যখন মুণি বৃন্দাবনে পৌঁছলেন তখন গোবর্ধন দেখলো যে, যে গোলোক বৃন্দাবনে সে ছিল তা এখানেও রয়েছে। গোপ-গোপীদের কোলাহল, পাখির গান, যমুনা নদী ইত্যাদি শুনে গোবর্ধনের ইচ্ছা হল সে এখানেই থেকে যাবে। তাছাড়া তার আর একটি দৈববাণীও মনে পড়ে গেল। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার এবং রাবণকে বধ করার জন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে পাথরের এক সেতু নির্মাণের জন্য বানর সৈন্যদেরকে আদেশ দেন। এদের মধ্যে হনুমান ছিলেন প্রধান। বানররা পাথর এনে এনে সমুদ্রে বাঁধ দিতে আরম্ভ করে। হনুমান দেখলেন যে নানা জায়গা থেকে পাথর আনতে অনেক

সময় লেগে যাচ্ছে। তখন তিনি গোলোকে চলে যান। সেখানে গিয়ে গিরিগোবর্ধনকে উত্তোলনের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু হনুমান শতচেষ্টা করেও গিরিগোবর্ধনকে উঠাতে পারলেন না। তখন হনুমান বুঝতে পারলেন যে নিশ্চয়ই ভগবানের কোন বিভূতি এই পর্বতের মধ্যে রয়েছে। তখন তিনি ৭ বার গোবর্ধনকে ভক্তি সহকারে পরিক্রমা করলেন। তখন গোবর্ধন জিজ্ঞাসা করলেন কিজন্য হনুমান তাকে নিয়ে যেতে চায়। হনুমান সবকিছু খুলে বলার পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য এককথায় রাজী হয়ে যান এবং নিজেকে হালকা করে নেন। যাতে হনুমান অতি সহজেই তাকে নিয়ে যেতে পারেন। তখন হনুমান গিরিগোবর্ধনকে মাথায় নিয়ে ত্রিকূট পর্বতের পথে রওনা হন। কিছুদূর যাওয়ার পর দৈববাণী হয় যে ইতিমধ্যেই সেতু তৈরী হয়ে গিয়েছে। আর পাথরের প্রয়োজন নেই। তখন হনুমান আবার গোবর্ধনকে আগের জায়গায় নিয়ে আসেন এবং তার কাছ থেকে বিদায় নেন। তখন গোবর্ধনের মনে ভীষণ দুঃখ হয়। কেন এবং কি অপরাধে তিনি ভগবানের সেবায় লাগতে পারলেন না। তখন আবার দৈববাণী হল যে এই যুগে তুমি ভগবানকে সেবা না করতে পারলেও পরবর্তী যুগে শুধু ভগবান নয় তাঁর পরিকরদেরকেও সেবা দিতে পারবে। এই কথা স্মরণ করে গোবর্ধন নিজেকে ক্রমশঃ ভারী করে তুলতে লাগলেন। একসময় এত ভারী হয়ে যান যে পুলস্ত মুণির পক্ষে আর তাকে হাতে রাখা সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়ে গোবর্ধনকে মাটিতে রেখে তিনি প্রাতঃকৃত্য করার জন্য বনে গেলেন। তারপর নদীতে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে গোবর্ধনকে তুলতে গেলে গোবর্ধন বললেন যে মুণি তাঁর শর্ত ভঙ্গ করেছেন। কাজেই তিনি আর মুণির সাথে যাবেন না। বার বার চেষ্টা করেও পুলস্ত মুণি আর গোবর্ধনকে তুলতে অসমর্থ হন। তখন এক সময় রেগে গিয়ে তিনি গোবর্ধনকে এই বলে অভিশাপ দেন যে গোবর্ধন প্রতিদিন তিল তিল করে ক্ষয়িত হবেন এবং একদিন মাটির সাথে মিশে যাবেন।

<u>৩. মুণির অভিশাপ কি ফলপ্রসু হয়েছে?</u>

প্রশ্ন জাগে মুণির অভিশাপে গোবর্ধন পর্বতের উপর কি প্রভাব ফেলেছে? বাস্তবে মুণির অভিশাপ হেতু ধীরে ধীরে কালক্রমে গোবর্ধন পর্বত ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে - একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যেমন তাঁর অভিশাপের আগে গিরি-গোবর্ধনের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ যোজন - অর্থাৎ ৮x৮ = ৬৪ মাইল (১ যোজন = ৮ মাইল), প্রস্থে ছিল ৫ যোজন - অর্থাৎ ৫x৮ = ৪০ মাইল এবং উচ্চতা ছিল ২ যোজন - অর্থাৎ ২x৮ = ১৬ মাইল। বর্তমান সময়ে দেখা যায় গিরিগোবর্ধনের দৈর্ঘ্য ৩০,০০০ মিটার - অর্থাৎ ৩০ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার হিসেবে) যা কম বেশী ২৫ মাইল এর মতো। আবার প্রস্থ হলো ১৫,০০০ মিটার = ১৫ কিলোমিটার যা কমবেশী ১২ মাইল-এর মতো হবে। পক্ষান্তরে এর উচ্চতা সবচেয়ে বেশী দ্রুত কমেছে। এখন কমবেশী মাত্র ২০০ মিটার = ০.২ কিলোমিটার। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে এবং মুণির অভিশাপহেতু গিরিগোবর্ধন অনেকটা দ্রুতগতিতে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে বলা যায়।

<u>৪.কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন লীলা এবং অন্নকূট মহোৎসব:-</u>

কৃষ্ণের বয়স তখন ৭ বছর। একদিন তিঁনি দেখলেন যে তাঁর বাবা নন্দগোপ সহ অন্যান্য বয়স্ক গোপরা অতি ব্যতিব্যস্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবা, তোমরা এত ব্যস্ত কেন?” নন্দ মহারাজ বললেন আজ দেবরাজ ইন্দ্রের পুজো। তাই পুজার বিভিন্ন আয়োজনে তারা ব্যস্ত। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন ইন্দ্রপুজো তারা কেন করছেন এবং এই পুজো করলে কিরূপ ফল হয়? নন্দ মহারাজ বললেন, তারা বৈশ্য - গোপালন এবং কৃষিকাজ হলো তাদের পেশা। ইন্দ্র হলেন বৃষ্টির দেবতা। তিনি কৃপা করে পরিমাণমত বৃষ্টিপাত করলে ঘাস, লতা-পাতা জন্মে যা গবাদি পশুর খাদ্য। আবার বৃষ্টি হলে সহজেই ধান সহ অন্যান্য কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করা সহজ হয়। তাই বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে এই দিন পুজো করা হয়। কৃষ্ণ তখন বললেন যে, বাবা, সমুদ্রের তো জলের অভাব নেই, তবুও সেখানে বৃষ্টি হয় কেন? বাবা, আসলে ইন্দ্র নয়, বরং গিরিগোবর্ধনের কল্যাণেই কৃষিকাজ সহ গো-বৎসদের পালন করা সম্ভব হচ্ছে। তাই ইন্দ্রের পুজো না করে আমাদের গিরিগোবর্ধনের পুজো করা উচিত। বর্ষিয়ান গোপরা দেখলেন কৃষ্ণ ঠিকই বলেছে। তাছাড়া এর আগেও তারা দেখেছে যে কৃষ্ণ তাদেরকে সবধরণের বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে এবং কৃষ্ণ কখনোই তাদের অমঙ্গল হয় এমন কোন কথা এবং কাজ করেনি। তাই সবাই ইন্দ্রপুজোর বদলে গিরিগোবর্ধন পুজোর মনোনিবেশ করলো। অর্থাৎ ইন্দ্রপুজোর জন্য যেসব চব্য, চোষ্য, লেহ্য ইত্যাদি ধরণের খাবার-দাবার তৈরী করেছিলেন তা সবই গিরিগোবর্ধন পর্বতের নীচে আসতে আরম্ভ করে। এই বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপাদ তাঁর গোপাল চম্পু বইতে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রথমে কলাপাতা বিছানো হয়। এরপর তার উপর প্রথমে বিভিন্ন ধরণের রুটী রাখা হয়। রুটীর উপর বিভিন্ন প্রকারের লুচি, পরোটা, হালুয়া ইত্যাদি রাখা হয়। তার উপর বিভিন্ন শাক-সব্জী রাখা হয়। তারপর বিভিন্ন ধরণের অন্ন-পোলাও

ইত্যাদি রাখা হয়। এর উপর নানা ধরণের দই, মিষ্টি, মিঠাই-মন্ডা ইত্যাদি রাখা হয়। এসব দ্রব্যাদি এত পরিমাণ রাখা হয় যে সেগুলোর একত্রিত রূপ গিরিগোবর্ধনের সমান উঁচু হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরণের দ্রব্যাদির এই ধরণের সাজানোকে অন্নকূট বলা হয় (কূট = পর্বত / গিরি) আর একে কেন্দ্র করে যে উৎসব পালিত হয় তাকে অন্নকূট মহোৎসব বলা হয়।

এই সময় কৃষ্ণ নিজেকে এক বিরাট আকার ধারণ করে (গোবর্ধনের সমান উচ্চ) ঐসব অন্নব্যঞ্জন মিষ্টি-আদি দ্রব্য খেতে শুরু করেন। আবার একটি ছোট কৃষ্ণ - অর্থাৎ ৭ বছরের কৃষ্ণ কোমরে হাত দিয়ে তা দেখতে লাগলো। বড় কৃষ্ণ বলতে লাগলেন "শৈলস্মি" - অর্থাৎ আমিই শৈল বা গিরিগোবর্ধন।

এদিকে ইন্দ্র যখন দেখলো যে তার পূজার জিনিসপত্র এখনো গোপরা তাকে নিবেদন করছে না - তখন সে একজন অনুচরকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য গোকুলে পাঠালেন। অনুচর এসে খবর দিলো - গোপরা পূজার সব দ্রব্য-সামগ্রী গোবর্ধনকে খাইয়ে দিয়েছে এবং নিজেরাও প্রসাদ পেয়ে যার যার বাড়ীতে ফিরে গেছে। ইন্দ্র তখন গোপদের শাস্তি দেয়ার জন্য প্রলয়কালীন মেঘ সম্পতক-কে ডেকে গোকুল বৃষ্টিতে এমনভাবে ভাসিয়ে দিতে বললেন যাতে সব গোপ এবং গবাদি পশু বিলীন হয়ে যায়। কথামত ঐ মেঘ ঝড়-ঝঞ্ঝাসহ গোকুলে আসতে আরম্ভ করে এসবের আলামত দেখে গোপরা কৃষ্ণের কাছে গিয়ে সকাতরে তাদেরকে রক্ষার আবেদন জানায়। কৃষ্ণ তখন রেগে গিয়ে ইন্দ্রকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁর বামহাতে গোবর্ধনকে হাতে তুলে নেন এবং হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে তা ধারণ করে গোপদেরকে তাদের গবাদিপশু সহ গিরিগোবর্ধনের নীচে আশ্রয় নিতে বললেন। এভাবে গিরিগোবর্ধন উঠানোয় তার নীচে এক বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয় এবং গোপ-গোপীরা তাদের গবাদিপশু সহ সেখানে আশ্রয় নেয়। বৃষ্টি যাতে ঐ গর্তে না পড়তে পারে সেজন্য কৃষ্ণ শেষ নাগকে ডেকে চারদিকে বেষ্টন করে থাকতে বলেন। এভাবে ৭ দিন ৭ রাত্রি কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধনকে ধরে রাখায় গোপ-গোপী ও গবাদিপশু নিশ্চিন্তভাবে সেখানে অবস্থান করতে সক্ষম হয়।

কিছুক্ষন পর ইন্দ্র বিদ্যুৎকে গোকুলের অবস্থা জানার জন্য পাঠান। সে এক ঝলক এসে আবার ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে জানায় - গোকুলের সব কিছুই বিনষ্ট হয়ে গেছে। কোন গোপ-গোপী এবং গবাদি পশুর চিহ্নও নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বায়ু এসে ইন্দ্রকে জানায় যে গোকুলের কিছুই নষ্ট হয়নি। সে বললো যে ইন্দ্রের জন্য বাগানে সব কিছুই পর্বতটা খেয়ে ভীষণ শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে এবং সে আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে। আর এর নীচে সমস্ত গোপ-গোপী এবং গবাদি পশু আশ্রয় নিয়েছে। তখন ইন্দ্র ভাবলো এই পর্বত-টাকে চুড়মার করে দিতে হবে। তাই তিনি এর পর উপর আঘাত করতে তার বজ্রকে আদেশ দিলেন। বজ্র বারবার গিরিগোবর্ধনকে আঘাত করতে লাগলো। কিন্তু গিরিগোবর্ধনের কোন ক্ষতি হলো না। কারণ স্বয়ং ভগবান একে ধরে রেখেছিলেন। অবশেষে ইন্দ্র ভাবতে লাগলেন এর কারণ কি? একসময় তিনি তার গুরুদেব বৃহস্পতির কাছে যান এবং সব কিছু তাকে খুলে বলেন। বৃহস্পতি ধ্যানস্থ হয়ে বললেন, ইন্দ্র, তুমি যাকে ৭ বছরের বালক বলে ভেবেছ, সেই কিন্তু তোমার প্রভু নারায়ণ স্বয়ং। একথা শুনে ইন্দ্র ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। তখন বৃহস্পতি বলেন, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা মাত্র উপায় আছে। তুমি সুরভী গাভীকে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে যাও। সুরভী হলো কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তাকে দেখলে কৃষ্ণের রাগ কমে যাবে। সুরভীর লেজ ধরে তুমিও যাবে এবং কৃষ্ণের রাগ কমে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণের দুইপা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইবে। বৃহস্পতির পরামর্শ অনুযায়ী ইন্দ্র কৃষ্ণের কাছে সবিনয় ক্ষমা চাইলে কৃষ্ণ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এভাবে ইন্দ্রের মোহভঙ্গ হয় কথিত আছে যে সুরভী গাভী তার দুধ দিয়ে কৃষ্ণের অভিষেক করেন। তিনি এত বেশী দুধ ক্ষরণ করেন যে গোকুল ভাসিয়ে যমুনায় পর্যন্ত ঐ দুধ পড়ে। এতে যমুনার কালো জল সাদা হয়ে গিয়েছিল।

<u>৫. গিরিগোবর্ধন লীলায় কি কি রসের সৃষ্টি হয়েছিল?</u>

শ্রীল রূপগোস্বামীর <u>ভক্তিরসামৃত সিন্ধু</u> গ্রন্থে ১২টি রসের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হল:-
(ক) মুখ্যরস
(i) শান্তরস
(ii) দাস্যরস
(iii) সখ্যরস
(iv) বাৎসল্যরস
(v) মাধুর্য রস

(খ) গৌণরস :- ৭টি
(i) হাস্যরস (যেমন বৃন্দাবনে খেলাধুলার সময় কৃষ্ণ সখারা হাস্যরস সৃষ্টি করে)
(ii) রৌদ্ররস (রাগলে / ক্রোধান্বিত হলে যে রসের সৃষ্টি হয়। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষার জন্য স্তম্ভ থেকে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ভগবান নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন।
(iii) করুণরস (যেমন পুতনা যখন ৭ দিনের শিশুরূপ কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তা দেখে যশোদাসহ অন্যান্যরা কান্নাকাটি করছিল যা করুণ রসের উদাহরণ)
(iv) অদ্ভুতরস (যখন গোপ-গোপীরা বকাসুর, কেশীদৈত্য ইত্যাদি অসুরকে দেখেছিল তখন তাদের মনে হয়েছিল এর আগে এত বড় বক এবং ঘোড়া তারা আর দেখেননি যা তাদের মনে অদ্ভুত মনে হয়েছিল। এটি হল অদ্ভুত রসের উদাহরণ।)
(v) ভয়ানক রস (যেমন কৃষ্ণকে যখন কালীয়নাগ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে তখন তাঁর প্রাণ সংশয়ের কথা চিন্তা করে নন্দ-যশোদা সহ অন্যান্য গোপ-গোপীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এই হল ভয়ানক রসের উদাহরণ।)
(vi) বীভৎস রস (যেমন পুতনাকে যখন রাক্ষসীরূপে কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুবরণ করে তখন তার বিকট দেহ দেখে গোপ-গোপীদের মনে যে ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা বীভৎস রসের উদাহরণ বলা যায়।
(vii) বীর রস (যেমন কৃষ্ণ যখন কালীয় নাগের বেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করে কালীয় নাগের ফণাসমূহের ওপর নৃত্য করছিল তখন কৃষ্ণ যে একজন প্রচন্ড বীর - এই ভাবনা গোকুলের গোপ-গোপীদের মনে উদয় হয়। এই হলো বীর রসের উদাহরণ।)

এখন দেখা যাক গিরিগোবর্ধন লীলায় এই ১১টি রসের মধ্যে কোন কোন রস কখন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।
প্রথমতঃ ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত সম্পতক মেঘকে দেখে গোপ-গোপীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তাদের মনে ভয়ানক রসের সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ যখন গিরিগোবর্ধন উত্তোলন করে থাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির ডগায় ধারণ করেন তখন তাঁর সখা মধুমঙ্গল (কৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সান্দিপনি মুনির ছেলে, নান্দিমুখীর ভাই এবং বৃন্দাবনের পৌর্ণমাসীর নাতি - রাখালরাজ কৃষ্ণের সভার বিদুষক অর্থাৎ ভাড় যে হাস্যরস মাঝে মাঝেই সৃষ্টি করতে পারতো। ভোগ আরতির সময় যে মধুমঙ্গলের কথা উল্লেখকার (ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল) বলেন, কৃষ্ণতো বৈশ্য; গাভী চড়ায় মাত্র। ওঁর কিভাবে শক্তি থাকবে গিরিগোবর্ধনকে উত্তোলণ করার। আমি ব্রাহ্মণ, তাই ওঁকে আমার ব্রহ্মতেজ দিয়েছি বলেইতো সে গিরিগোবর্ধনকে উত্তোলণ করতে সমর্থ হয়। এতে গোপ-গোপীদের মনে প্রচুর হাস্য-রসের সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়তঃ গিরিগোবর্ধনকে বাম হাতে রাখার পর মাঝে মাঝে কৃষ্ণ রাধা এবং অপরাপর সখীদের দিকে আড়চোখে চাইতে থাকে এবং মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন। এক্ষেত্রে মধুর রসের সৃষ্টি হয়। আবার মধুর রসহেতু কিছুটা হাস্যরসেরও সৃষ্টি হয়।

চতুর্থতঃ কৃষ্ণ যখন আড়চোখে রাধারাণী সহ অপরাপর গোপীদের দিকে তাকাতে থাকেন তখন হাতের ভারসাম্য সামান্য নষ্ট হওয়ার কারণে গিরিগোবর্ধন কিছুটা ঝুলতে থাকে। কৃষ্ণের হয়তো কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে প্রবীণ পুরুষ গোপরা তাদের লাঠি দিয়ে গোবর্ধনকে ঠেকা দিতে থাকেন। এভাবে এক্ষেত্রে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হয়।
আবার নন্দ, সুনন্দ, উপানন্দ প্রমুখ প্রবীণ গোপগণ কৃষ্ণকে স্নেহ করেন বলেই তাঁর পরামর্শে ইন্দ্রপুজা ছেড়ে গিরিগোবর্ধনের পুজা করতে রাজী হন। এটিও বাৎসল্য রসের একটি উদাহরণ।
অন্যদিকে প্রবীণ গোপীরা বলেন যে কৃষ্ণ তাদের ঘর থেকে ননী চুরি করে খাওয়ার জন্যই তাঁর দেহে এত শক্তি সঞ্চার হয় যে সে গিরিগোবর্ধন তুলে ধরতে সক্ষম হয়। এটিও বাৎসল্য রসের আর একটি উদাহরণ।

পঞ্চমতঃ ভগবান কৃষ্ণ ৭ দিন ৭ রাত্রি গিরিগোবর্ধন ধারণ করে তার বীরত্বের প্রমাণ দেন। এক্ষেত্রে তিনি বীররস সৃষ্টি করেন বলা যায়।

ষষ্টতঃ কৃষ্ণ ৭ দিন-রাত গিরিগোবর্ধনের মত একটা বড় পর্বতকে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ধারণ করেছিলেন। এই দেখে গোপ-গোপীরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়। তারা একে কৃষ্ণের অদ্ভুত কার্য্য বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়।

সপ্তমতঃ গিরিগোবর্ধন যখন কিছুটা দুলছিল (রাধারাণী সহ অন্যান্য সখীদের দিকে মাঝে মাঝে কৃষ্ণের ভ্রুকুটি নিক্ষেপহেতু) তখন তার সখারা কৃষ্ণের কষ্ট হচ্ছে মনে করে তারাও তাদের লাঠি দিয়ে গোবর্ধনকে ঠেকা দেয়ার চেষ্টা করেন। সখার কষ্টে অপরাপর সখাদের অনুভূতি হেতু এক্ষেত্রে সখ্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়।

সবশেষে, ইন্দ্র যখন ভয় পেয়ে বৃহস্পতির কাছ থেকে জানতে পারেন যে কৃষ্ণই হচ্ছেন তার প্রভু নারায়ণ তখন তার মনে দাস্যভাবের সৃষ্টি হয়েছিল বলা যায়।

৬. গিরিগোবর্ধন লীলার অন্তর্গত অন্নকূট মহোৎসব এবং ৫৬ ভোগের রহস্য:
অন্নকূট মহোৎসবে (বলা হয়ে থাকে) কমপক্ষে ৫৬ প্রকারের অন্নব্যঞ্জন বিশিষ্ট ভোগ গিরিগোবর্ধনকে নিবেদন করতে হয়। এই ধরণের ভোগনিবেদনের রহস্য হল:- ভগবান কৃষ্ণ যখন গিরিগোবর্ধনকে ৭ দিন ৭ রাত ধরে রেখেছিলেন তখন গোপীরা প্রতিদিন তাঁকে ৮ ধরণের অন্নব্যঞ্জন বিশিষ্ট ভোগ নিবেদন করতো। আবার কৃষ্ণও এই নিবেদিত ভোগ খেয়ে অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করতেন। সেই থেকে আজও অন্নকূট মহোৎসবে কৃষ্ণের জন্য ভক্ত-ভক্তিনগণ কমপক্ষে ৫৬ ভোগ একদিনেই নিবেদন করেন। তবে এর চেয়ে বেশী পদ রান্না করেও কৃষ্ণকে নিবেদন করা সম্ভব। ইন্টারনেট-এ একটি ইউটিউব চ্যানেলে দেখানো হয়েছে যে ২০২২ সালে বাংলাদেশের ঢাকার ইসকন মন্দিরে অন্নকূট মহোৎসবে ২০৮১ সংখ্যক পদ রান্না করে কৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়। তাই কমপক্ষে ৫৬ এবং বেশী সংখ্যক পদ রান্না করে ভোগ কৃষ্ণকে ভক্ত এবং ভক্তিনরা নিবেদন করতে পারবেন বৈকি।

৭. গিরিগোবর্ধন আসলে কে?
গিরিগোবর্ধন সম্পর্কে প্রচলিত ধর্মীয় ৩টি মত পাওয়া যায়।
(i) প্রথমতঃ বলা হয় একসময় অপ্রাকৃত গোলকধামে একসময় কোন কারণে কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধারাণী বিগলিত হয়ে যান। তিনি অনর্গল অশ্রুপাত করতে থাকেন। এই অশ্রু একসময় পাথরে রূপান্তর হয়ে গিরিগোবর্ধনের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই গিরিগোবর্ধন এক অর্থে স্বয়ং রাধারাণী।

(ii) দ্বিতীয়তঃ গিরিগোবর্ধন হলো হরিদাসবর্য - অর্থাৎ কৃষ্ণের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। শাস্ত্র অনুযায়ী ৪ জন হরিদাস আছেন: কৃষ্ণ-সখা উদ্ধব, যুধিষ্ঠির মহারাজ, হরিদাস ঠাকুর এবং গোবর্ধন। এই চারজনের মধ্যে গিরিগোবর্ধন হলেন শ্রেষ্ঠ - অর্থাৎ হরিদাসবর্য।

(iii) তৃতীয়তঃ শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে দেখা যায় গোবর্ধনলীলার সময় কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধনের সমান উঁচুরূপ পরিগ্রহ করে বলতে থাকেন, "শৈলহস্মি" - অর্থাৎ আমিই গিরিগোবর্ধন। তাই গিরিগোবর্ধন হলেন কৃষ্ণ স্বয়ং। এজন্য অনেক ভক্ত গিরিগোবর্ধন পরিক্রমার সময় কখনো তাঁর উপরে উঠেন না।

৮. গিরিগোবর্ধন লীলা শ্রবণের ফল/মাহাত্ম:
কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন লীলা শ্রবণ করলে নিম্নোক্ত ফললাভ হয়।

(ক) প্রথমতঃ যে শোনে সে তার জঘন্যতম পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে। অর্থাৎ যত ধরণের মারাত্মক পাপ আছে গোবর্ধন লীলা শুনলে সেই পাপাদি থেকে শ্রোতা মুক্তিলাভ করবে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ শ্রোতার বিমুক্তিলাভ হয়। সাধারণত মুক্তি পাঁচ ধরণের হয়:-

(i) সাজুর্য্যমুক্তি :- ভগবানের গায়ের রশ্মির সাথে অথবা স্বয়ং ভগবানে লীন হয়ে যাওয়া বোঝায়। এধরণের মুক্তিলাভ ভক্তরা কোনক্রমেই গ্রহণ করতে চায় না।

(ii) সাষ্টিমুক্তি :- ভগবানের সমান ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া বোঝায়। অর্থাৎ এই ধরণের মুক্তির বেলায় ভগবান ভক্তকে তাঁর সমান পরিমাণ ঐশ্বর্য্যের মালিক করে দেন। এই ধরণের মুক্তিও শুদ্ধ ভক্তগণ নিতে চান না।

(iii) সামীপ্যমুক্তি :- অর্থাৎ সব সময় ভগবানকে কাছে পাওয়ার সুযোগে তাঁকে সবসময় সেবা করার সুযোগ এরূপ মুক্তির বেলায় পাওয়া যায়। সাধারণত কনিষ্ঠ ভক্তরা দাস্য ভাবে ভগবানকে সেবা করতে আগ্রহী হন। তারা এই ধরণের মুক্তি না চাইলেও ভগবান তা দিয়ে থাকেন।

(iv) সারূপ্যমুক্তি :- ভগবানের মতো সমান রূপ পাওয়া বোঝায়। অর্থাৎ দেহের অবসানে ভক্ত ভগবানের কৃপায় চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে বৈকুন্ঠে গমণ করতে পারেন। এরূপ মুক্তি সুদুর্লভ হলেও গিরিগোবর্ধন লীলা অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলে ভগবান ভক্তকে এই ধরণের মুক্তি দিতে পারেন।

(v) সালোক্য মুক্তি :- ভগবান যে যে লোকে / ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন তাঁর সাথে ভক্তও বিচরণ করতে পারেন। ভগবানের নিত্যলীলায় এরূপভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ একমাত্র অতি শুদ্ধের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব।

ভগবৎ ভক্তগণ কোন ধরণের মুক্তি লাভেই আগ্রহী হননা। তারপরও এই ইহজগতে তাঁর অকৃত্রিম সেবা করলে ভগবান ইচ্ছা করেই ভক্তের সেবার স্তর এবং ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন ভক্তকে শেষোক্ত চার ধরণের যে কোন মুক্তি দিতে পারেন।

৯. গিরিগোবর্ধন লীলা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :-

(ক) প্রথমতঃ কোন ভগবৎ ভক্ত যদি সাংসারিক / সামাজিকভাবে প্রতিপালনীয় কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে তবে পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে সেই পরামর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত।

(খ) দ্বিতীয়তঃ যদি উচ্চতর স্তরের ভক্তের (যেমন সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্ত) সাথে নিম্নস্তরের - অর্থাৎ দাস্যভক্ত কোন অপরাধ করে তবে ভগবান শেষোক্ত ভক্তকে প্রয়োজনে শাস্তি দেন। এরপর ঐ শেষোক্ত ভক্ত যদি অন্য কোন উচ্চস্তরের ভক্তের সহায়তায় দাসত্ববোধে ভগবানের কাছে এবং ভক্ত/ভক্তদের কাছে আত্মসমর্পণম / কায়মনোবাক্যে ক্ষমা চান তবে তিনি / তারা ক্ষমা পেয়ে থাকেন। ভগবান অত্যন্ত করুণাময়। তা নাহলে ইন্দ্র তাঁর ভক্তদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য যে সব ব্যবস্থা নেন তা ক্ষমার অযোগ্য ছিল। কিন্তু সুরভী গাভীর মতো অতি শুদ্ধভক্তের সেবার কারণে তিনি ইন্দ্রকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

(গ) তৃতীয়তঃ কলির ভাগ্যহত জীবদেরকে শোষণ এবং শাসন করবার জন্য আজকাল অনেক ভন্ড ভগবানের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। অবতারের ছড়াছড়ি আর কি? এসব অবতার বা তাদের শিষ্যদেরকে যদি বলা হয় গিরিগোবর্ধনতো দূরের কথা ২ মন ওজনের একটা পাথরকে ঐ তথাকথিত অবতাররা হাতের তালুতে ৫/৬ দিন ধরে রাখতে পারলে আমরা তাকে / তাদেরকে ভগবান বলে স্বীকার করে নেব।

আমার পরমারাধ্য গুরু মহারাজ শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী তাঁর এক প্রবচনে এই ধরণের ভন্ড অবতারের দুটি বিষয় তুলে ধরেছিলেন। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি নাম না উল্লেখ করে এক ভন্ড অবতারের বিষয়ে বলেন যে সেই ভগবান মারা গিয়েছেন। ভগবান হলে সাধারণ মানুষদের মতো তার মৃত্যু হয় কি করে? দ্বিতীয়তঃ, তিনি উল্লেখ করেন যে দিল্লিতে একসময় শ্রীল প্রভুপাদের কাছে একজন ৩০/৩৫ বছরের যুবক এসে দাবী করেন যে তার গুরুদেব স্বয়ং ভগবান। প্রভুপাদ তাকে একটি টেবিল দেখিয়ে বলেন তার ভগবান কি ৭ দিন ৭ রাত সেটি যে কোন ভাবে তুলে ধরে রাখতে পারবেন? জিজ্ঞাসা কর তাকে। যুবক প্রভুপাদের কথামত তার গুরুকে ঐ কথা বললে সে বলে তা কি করে হয়? এভাবে সেই তথাকথিত অবতারের হাত থেকে যুবকটি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় রক্ষা পায়।